

*Lecture prepared by*  
**Dr. Ishani Ghosh**  
Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

**HONOURS CORE COURSE – 10**  
**History of India (1757-1857)**  
**SEMESTER – 4**  
**PAPER – X**

Date : 24.03.2020(Monday) - 29.03.2020 (Sunday)

**TOPIC : Socio-Religious Reform Movement in the first half of the nineteenth century**  
**(Rammohan Roy – Brahmo Samaj – Young Bengal and Vidyasagar)**

ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের কালিনগর মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের Whatsapp group ও মহাবিদ্যালয়ের Website এ এখন থেকে ক্লাস করাবো।

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

(রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজ, ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

**রামমোহন রায় — ভারতের সমসাময়িক ধর্মব্যবস্থা**

আধুনিক ভারতের শ্রীষ্টা ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মব্যবস্থা — পৌত্তলিকতা, পুরোহিততন্ত্র, নানা অনুষ্ঠান ও আচরণবিধি ইত্যাদিকে তার উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে গণ্য করেন।

রাজা রামমোহন রায় খ্রিষ্টান ধর্মশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এহ ধর্মের নৈতিকতা ও সেবামূলক দিকটি গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ ও যুক্তিবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

**ধর্মীয় সংস্কার**

রাজা রামমোহন রায় ‘তুফাৎ-উল-মুবাহিদিন’ নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন যেখানে তিনি একেশ্বরবাদে আস্থা রেখে সমষ্ণবাদী চিন্তার পরিচয় দেন। রামমোহন রায়ের ঈশ্বর ছিলেন নিরাকার ব্রহ্ম।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। যেখানে সব ধর্মের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমষ্ণবাদী, ধর্মের ঐক্যে বিশ্বাসী।

তিনি বিশ্বজনীন মানব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। রামমোহন রায় দাবি করেছিলেন যে তিনি আচার অনুষ্ঠানহীন, পৌত্তলিকতা বিরোধী, পুরোহিততন্ত্র বিরোধী একেশ্বরবাদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কিন্তু, রাজা রামমোহন রায় জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না ঠিকই, কিন্তু বাস্তব জীবনে সংস্কারের সব বন্ধন থেকে তিনি নিজেই মুক্ত করতে পারেন নি। ব্রাহ্ম সমাজে শুধু ব্রাহ্মণরা বেদপাঠের অধিকার পেয়েছিল, সভা পরিচালনা করতো ব্রাহ্মণরা, রামমোহন

Lecture prepared by  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

রায় নিজে উপবীত ত্যাগ করেননি। তিনি কখনও দাবি করেন নি যে তিনি একটি নতুন ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন করেছেন। তাঁর যুক্তিবাদী, উপযোগবাদী ধর্মভাবনা সাধারণ মানুষকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি।

### শিবনাথ শাস্ত্রী (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ)

লিখেছেন যে “তাঁর (রাজা রামমোহন রায়) ধর্মভাবনা ছিল অনেকটা নেতিবাচক; সংস্কারমুখী ইতিবাচক বা গঠনমূলক একে বলা যায় না।”

### ভারতের সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা

তৎকালীন সমাজ জীবন ছিল তমসায় আচ্ছন্ন। কয়েকটি কুপ্রথা ও কুসংস্কার যেমন — সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কুলীন প্রথা সমাজে মানুষের অজ্ঞতা ও ভীতির সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তির স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের অজুহাতে এই সব ঘৃণ্য সামাজিক কুপ্রথা গুলিকে উৎসাহ দান করতো। শাস্ত্রীয় বিধান হিসেবে।

পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রামমোহন রায় উপলব্ধি করলেন যে, ভারতকে কুসংস্কার ও জড়ত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হলে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন উদারপন্থী গভর্নর জেনারেল বেন্টিকের সমসাময়িক এবং সমাজ সংস্কারের বিষয়ে তাঁর উগ্র সমর্থক।

ধর্মসংস্কারের পাশাপাশি তিনি সমাজ সংস্কারেও ব্রতী হন।

### সতীদাহ প্রথা

রামমোহন রায়ের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক আন্দোলন হলো ‘সতীদাহ’ প্রথার বিরুদ্ধে। এই সুপ্রাচীন ও নির্মূল প্রথার ফলে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক হিন্দু বিধবাকে মৃত স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সহমৃত্যু হতে হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধবাদের আত্মীয়-স্বজন একরকম জোর করেই তাদের সহমৃত্যু হতে বাধ্য করতো।

প্রগতিশীল ও উদারপন্থী ভারতীয় ও ইংরেজরাই এই অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। গোড়ার দিকে কোম্পানি সরকারও এধরনের বিতর্কমূলক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি।

রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলেন — এই ব্যাপারে লর্ড বেন্টিক ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে সমর্থন করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের কাজে ব্রতী হন। একদিকে হিন্দুশাস্ত্র থেকে নানা উদ্ধৃতি তুলে দাবি করেন যে হিন্দুধর্মে সতীদাহ প্রথার কোন স্থান নেই। অপরদিকে তিনি সভা সমিতি, সংবাদপত্রে (সম্বাদকৌমুদী, মিরাত-উল-আখবর, Brahmanical Magazine) তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে জনমত গঠন করে সতীদাহ প্রথার মতো এই ঘৃণ্য প্রথার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটলেই যে এইসব কুপ্রথা দুর্বল হয়ে যাবে সেটাই তিনি মনে করতেন। এমনকি নিজে শ্মশান ঘাটে উপস্থিত থেকে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দেওয়া থেকে সদ্যবিধবাকে নিবৃত্ত করার ক্রটি করতেন না।

শেষ পর্যন্ত গৌড়াপন্থীদের বিরোধিতা সফল হলো না।

উপযোগবাদী এবং ইউরোপের উদারনৈতিক আদর্শ বিশ্বাসী লর্ড বেন্টিক, সুপ্রীমকোর্ট, পুলিশ ও সামরিক অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই অমানবিক ঘৃণ্য প্রথা রদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সমাজ কল্যাণমূলক কাজে খ্রিস্টান মিশনারিরাও বড়লাট বেন্টিককে সমর্থন করেছিলেন।

অবশেষে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে আইন পাশ করে সতী প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো। রাজা রামমোহন রায় বড়লাটের এই পদক্ষেপ সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন এবং এই আইন বজায় রাখার জন্য বিলেত যাত্রা করলেন।

এছাড়াও রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য, বহু বিবাহ, কুলীন প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রথার বিরোধিতা করেন।

হিন্দু নারীকে সুশিক্ষা প্রদান করা এবং তাদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবি স্বীকার করা প্রভৃতি বিষয় তাঁর চেষ্টার ক্রটি ছিল না।

Lecture prepared by  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয় — বাংলা রেনেসাঁসেব প্রাণপুরুষ। কিন্তু ঐতিহাসিকরা তাঁর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন। একদিকে তাঁকে আধুনিক যুগের পথিকৃৎ ও প্রথম ‘আধুনিক ভারতীয়’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ‘ভারত পথিক’ বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অপরদিকে তাঁকে ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক David Koff-এর মতে বাংলার নবজাগরণের মূলে কোন ব্যক্তির বিশেষ অবদান ছিল না। অপর এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Sumit Sarkar (Modern India) রামমোহন রায়ের চিন্তা ও কার্যকলাপের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল “unsatisfactory half way house” অর্থাৎ অসন্তোষজনক ও অসম্পূর্ণ। তিনি মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের কথা চিন্তা করেন নি এবং তাঁর প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন রায়ের অবদান ছিল বুদ্ধি ও মেধার কাছে — সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন নি। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক Salauddin Ahmad রামমোহন রায়ের সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে ধর্ম বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে ইউরোপে মার্টিন লুথার যে রকম সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন সেই তুলনায় রামমোহন রায় ছিলেন একজন ‘সংযত সংস্কারবাদী’ এবং তিনি ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

(He assumed the sole of a cautious reformer rather than a militant revolutionary ..... He did not believe in leading or creating a mass movement by openly defying established practices)

এই নবজাগরণের ভিত্তি হল ভারতীয় সমাজের ওপর ব্রিটিশ প্রভাব। বলা হয় রামমোহন রায়ের মৌলিকতা ও মহত্বের উৎস হল তাঁর সমন্বয়বাদী ধর্মচিন্তা। চিন্তায় ও মননে তিনি ছিলেন সর্বধর্মের প্রতি সহনশীল। তাঁর ধর্মচিন্তায় দুটি দিক লক্ষণীয় — যুক্তি ও সামাজিক উপযোগিতা।

পরবর্তীকালে অবশ্য রামমোহন রায় এই চিন্তাধারা থেকে সরে আসেন। হিন্দুদের কর্মফল ইত্যাদি বিষয় তিনি আক্রমণ করেন নি। সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে তাঁর ধর্মতত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে অনেকটাই ফারাক ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্ম যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও সামাজিক ক্ষেত্রে উপযোগী ছিল না। তিনি নিজে উপবীত ত্যাগ করেন নি, ব্রাহ্মণ পাচক নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান। ভারতে তাই ব্রাহ্ম আন্দোলন তেমন সাফল্য লাভ করে নি।

কিন্তু এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন ছিলেন আধুনিক ভারতের ঋত্বিক। তিনি যে আধুনিকীকরণের সূচনা করেছিলেন তা সমগ্র উনিশ শতকের নবচেতনার দিক নির্দেশ করেছিল।

[শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহন রায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষ করে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি (David Hare) ডেভিড হেয়ার নামক একজন মিশনারীর সহযোগীতায় বহু স্কুল স্থাপন করে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহনের আদর্শ ছিল প্রগতিশীল। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এই আদর্শই পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল।

প্রথম দিকে ইংরেজ শাসনের উপযোগিতার সমর্থক হলেও তিনি সরকারের কোন কোন নীতি ও ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার খর্ব করার জন্য সংবাদপত্র-বিধি (Press Ordinance) বলবৎ হলে রামমোহন রায় ও বাংলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা।

রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে কলকাতার পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক সংবাদ-বিধির বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে এক স্মারকপত্র দাখিল করেন।

Ramesh Chandra Dutt এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক অধিকার লাভের এক মহান আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন।

সেই সময় শুধুমাত্র খ্রিস্টানদেরই জুরী-পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। ভারতবাসীকে এই পদ থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধেও রাজা রামমোহন রায় প্রতিবাদ করতে জুটি করেন নি।

কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও তিনি সোচ্চার হন। জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেন্টে এক অভিযোগপত্র পাঠালেন।

Lecture prepared by  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

আরও অন্যান্য বিষয় যেমন — উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ, সমর বিভাগের ভারতীয়করণ, জুরী প্রথার প্রবর্তন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-সংকলন, নতুন আইন বলবৎ করার আগে ভারতীয় নেতৃবর্গের পরামর্শ গ্রহণ; সরকারী ভাষা হিসাবে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও রামমোহন রায় সুপারিশ করেন এবং নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

### ব্রাহ্ম সমাজ

ভারতের সামাজিক ইতিহাসে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অবদান নগণ্য নয়। ব্রাহ্ম আন্দোলন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের উপর প্রচণ্ড আঘাত আনে। হিন্দু সমাজের কু-সংস্কার সম্বন্ধে মানুষ ক্রমেই সচেতন হয়ে ওঠে।

এক সর্বজনীন ধর্ম ও উদারনৈতিক সমাজের আদর্শ স্থাপন করে ব্রাহ্ম সমাজ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষের সহায়ক হয়।

ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ণভেদ-বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় সমাজে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সেবার কাজে যুবকদের সংশ্লিষ্ট করে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রথম যুব আন্দোলনের সূচনা করে।

‘ব্রাহ্মিকা সমাজ’ গঠন করে নারী সংগঠনের সূচনা করে। পর্দা-প্রথার বিলুপ্তিসাধন, বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধকরণ, বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ এবং নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি বিবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় মানুষকে সচেতন করে, আন্দোলন করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে সমর্থ হয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্য এবং সকল সংগঠনের গণতন্ত্রীকরণের আদর্শ প্রচার করে ব্রাহ্ম-সমাজ ভারতবাসীকে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়।

হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ফলশ্রুতি হল সরকার কর্তৃক অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি আইন-প্রণয়ন।

পরবর্তীকালে একেশ্বরবাদ ও অপৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের সকল বিধানগুলিও হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল।

একথা ঠিক যে, ব্রিটিশ শাসনের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এই জাতীয়তাবাদ প্রথমে ধর্মীয় ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নবজাগরণকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

ফরাসী বিপ্লবের মূলে যেমন দার্শনিক ও চিন্তাশীলদের প্রভাব দেখা যায় তেমনি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রসারে বিশেষ সাহায্য করে।

এর প্রথম দৃষ্টান্ত হলো রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ। এই সমাজকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না।

পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন সামাজিক সংস্কারের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে জাতীয় ধর্ম ও চেতনার সঞ্চয় করেন।

সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলার পথিকৃত হলেও এর চেউ ক্রমে সমগ্র ভারতে প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ কবে।

এই দিক থেকে ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

### প্রার্থনা সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন বাংলাদেশের বাইরেও প্রসার লাভ করেছিল। মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টার ফলে মহারাষ্ট্রে ‘প্রার্থনা সমাজ’ নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি হয়।

সমাজ-উন্নয়ন ও নারী-কল্যাণ ব্যাপারে প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্ম সমাজের কর্মসূচী অনুসরণ করতো। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সমাজের দুঃস্থদের উন্নয়ন প্রভৃতি প্রার্থনা সমাজের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের প্রচেষ্টায় বহু শিশুসদন, অনাথ-আশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পশ্চিম ভারতের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ‘প্রার্থনা সমাজ’ এবং এর নেতা ছিলেন বোম্বাই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি মাধব গোবিন্দ রাণাডে।

প্রার্থনা সমাজের উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য তিনি দক্ষিণাভ্যে ‘শিক্ষা-সমিতি’ (Deccan Education Society) এবং ‘বিধবা-বিবাহ সমিতি’ (Widow Marriage Association) প্রতিষ্ঠা করেন।

Lecture prepared by  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব দেখা যায়। তিনি প্রচার করতেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তির উপরই সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব এবং অপর দিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় উন্নীত হতে হলে সামাজিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। এই কারণেই তিনি বার্ষিক জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে একটি সামাজিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচার করেন।

### আর্য সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ — দুটিই পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল।

কিন্তু আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকেই তারা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

‘আর্য-সমাজ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মোন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল বেদ। বেদের নির্দেশ ও আদর্শ অনুযায়ী তিনি সমাজ গঠন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের মতো তিনিও ছিলেন একেশ্বরবাদী ও অপৌত্তলিক। তিনিও বর্ণপ্রথা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি রীতি-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন।

দয়ানন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মোন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ‘শুদ্ধি’ অর্থাৎ অহিন্দুকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ। শুদ্ধি আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল “ভারতকে এক জাতি, এক ধর্ম এবং এক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করা”। রামমোহন রায়ের মতো দয়ানন্দও নিজের মতবাদ প্রচার কল্পে ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তবে দয়ানন্দ তাঁর মতবাদ শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, জনসাধারণের মধ্যেও তিনি তা প্রচার করেন। এর ফলে তাঁর মতবাদ সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে আর্য সমাজ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে আর্য সমাজের অবদান কম গৌরবের নয়। স্বামী দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তন্ত্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্যে আঘাত হেনে বেদকে সনাতন ধর্মের একমাত্র ভিত্তি রূপে চিহ্নিত করেন। তিনি রামমোহন রায়ের মতো সমন্বয়বাদী ধর্মচিন্তা করেন নি আবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত ‘যত মত তত পথ’-এর পক্ষে অনুসরণ করেন নি। তিনি অনমনীয়ভাবে হিন্দুধর্মের অনুসরণ ও অনুশীলন চেয়েছিলেন, অন্য ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান তাঁর কাম্য ছিল না।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ জীবনে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তা দুটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হয়।

- ১। যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তার আলোকে উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়।
- ২। একদল যুবগোষ্ঠী পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে উগ্র পাশ্চাত্যবাদী সংস্কার আন্দোলনের পথ যার প্রবর্তক হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরী লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও।

### নব্যবঙ্গ আন্দোলন

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর (ইতালীর র্যানেসাঁস : বাঙালীর সংস্কৃতি)-র মতে ডিরোজিওর চিন্তামানসে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় চিন্তাধারার দুটি ধারার প্রভাব পড়েছিল — এগুলি হল সর্বজনীন ও যুক্তিবাদী এবং সীমাবদ্ধ ও আবেগ প্রবণ রোমান্টিক।

ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামী তরুণ প্রজন্ম পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও রোমান্টিক দুই ধারণাকেই আবাহন করেছিলেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তোলেন। এঁরাই ‘ইয়ং-বেঙ্গল’ বা ‘নব্যবঙ্গ’ নামে পবিচিত।

তাঁর ছাত্ররা যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ‘পার্শ্বনন’ ও ‘বেঙ্গল স্পেকটেক্টর’ নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এই চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে তাঁরা আচার-আচরণ ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রচলিত রীতি নীতির ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠে।

হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে তারা প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং চরম মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্ম বর্জন করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবার কেউ কেউ নাস্তিকে পরিণত হয়।

Lecture prepared by  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষের জন্য নব্যবঙ্গের ছাত্ররা একাধিক বিতর্ক ও আলোচনা সভা স্থাপন করেন। এগুলির মধ্যে ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য (১৮২৮ খ্রি:)।

ডিরোজিও-র নেতৃত্বে এই সভায় ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও বিতর্ক হত। হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তিপূজা, বর্ণভেদ প্রভৃতি বিষয়ের তীব্র সমালোচনা হত।

ফুলের কুঁড়ির মত বিকশিত স্বপ্নদর্শী তরুণদলই বাংলার নবচেতনার ইতিহাসে ‘ইয়ংবেঙ্গল’ নামে পরিচিত। এরা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত, ডিরোজিও-র ব্যক্তিত্বে অভিভূত এবং আচার-আচরণে অন্তত অনেকে প্রচলিত আচার-আচরণের বিরোধী।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরানুকরণের দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় পচনশীল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি। কলেজের ছাত্রদের আচরণ রক্ষণশীলদের অসন্তোষের কারণ হয়। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে রক্ষণশীলরা চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা ও চিন্তাধারার নতুন করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

### ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। সেই সময় বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। যদিও তিনি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের বড় মাপের পন্ডিত, তথাপি পাশ্চাত্যের প্রগতিমূলক আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

বিদ্যাসাগর ছিলেন যুক্তিবাদী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ব্যাধি পতিকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

তিনি ছিলেন প্রগতিশীলতার প্রতিমূর্তি। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, আত্মনির্ভরশীল। কারোর দয়ামায়ার উপর নির্ভর না করে বলিষ্ঠ চিন্তে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতেন।

আধুনিক ভারতের শ্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং কতকগুলি বিধি চালু করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করেন এবং ইংরাজীকে আবশ্যিক পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরাজী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গে ছাত্ররা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

### সামাজিক সংস্কার

সে সময়ে হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহকে কেন্দ্র করে এক তীব্র আন্দোলন সূচিত হয়। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন। তিনি যুক্তি ও শাস্ত্রের নির্দেশের উপর নির্ভর না করে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে এক সহস্র সাক্ষর সম্বলিত একখানি আবেদন পত্র সরকারের কাছে পেশ করেন। রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বে শেষ পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে বাংলায় বিধবার প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে এই বিবাহটি সম্পন্ন হয়।

এরপর বিদ্যাসাগর বিভিন্ন স্থানে বিধবাদের বিবাহ দিতে সমর্থ হন এবং এরজন্য নিজেই ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র এক বাল-বিধবাকে বিবাহ করলে বিদ্যাসাগরের সংকল্প সফল হয়।

আত্মীয়-স্বজন ও রক্ষণশীল হিন্দু-পন্ডিত সমাজের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন বিদ্যাসাগরকে তাঁর মহান আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। তাঁর মানসিক দৃঢ়তাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল।

এরপরে বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি সমগ্রজীবন ধরে হিন্দুদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তিনি নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারেরও প্রতী হন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী (Vidyasagar, The Traditional Moderniser) বিদ্যাসাগরকে একজন ‘Traditional Moderniser’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যে চিন্তার ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাছে “আধুনিক হতে হলে

Lecture prepared by  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

পশ্চিমকে জড়িয়ে ধরলে চলবে না (ইয়ংবেঙ্গল), আবার স্থবির প্রাচ্যকেও আঁকড়ে ধরলেও চলবে না (প্রাচীনপন্থা রক্ষণশীল পন্থিত)। অর্থাৎ ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যেও রয়েছে আধুনিক হবার মূল উৎস তাকে উদ্ধার করে যুগের প্রয়োজনে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামমোহনের মতাদর্শগত মিল দেখা যায় তবে প্রায়োগিক দিক থেকে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

রামমোহন রায়ের মতো বিদ্যাসাগর নিছক যুক্তির নিরিখে সবকিছু যাচাই করেন নি। বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রধানত মানবতাবাদী, তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও হৃদয়ানুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন।

### ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমিতাভ মুখার্জীর (Reform and Regeneration in Bengal) মতে —

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বহু মাত্রিকতা উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি সংস্কার আন্দোলনে বাঙালী সমাজ তিনটি সুস্পষ্ট খাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

- ✦ রক্ষণশীল গোষ্ঠী সামাজিক স্থিতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই সংস্কার আন্দোলনের প্রতি তাঁদের অনীহা ও এমন কি বিরোধিতা দেখা যায়। রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ এই গোষ্ঠীর প্রবক্তা ছিলেন।
- ✦ মধ্যপন্থী গোষ্ঠী প্রাচীন আচার-আচরণকে একেবারে ত্যাগ না করে কিছুটা সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন — প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
- ✦ একদল উগ্রপন্থী আমূল সংস্কারবাদী গোষ্ঠী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল করতে চাইলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য আচার-আচরণে পারদর্শী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বয়সে নবীন এই সব উগ্র সংস্কারবাদীরা শুধুমাত্র প্রচলিত সামাজিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর ছিলেন তা নয়, সামাজিক শ্রোতকেও তারা নস্যৎ করে নিজেদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণা বর্জন করে এগোতে চাইলেন।

এবার বাংলার সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপারে চার ধরনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় —

১. সমস্ত সংস্কারবাদীই ছিলেন যুক্তিবাদী। তাই অমানবিক সামাজিক কুসংস্কারগুলি তাদের কাছে বর্জনীয় বলে মনে হয়েছিল।
২. যেহেতু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সমর্থক হয়ে উঠেছিল, তাই সংস্কারকগণ শাস্ত্রের প্রবচনের সাহায্যে সংস্কার আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন, সতীদাহ-প্রথার নিবারণে ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তনে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর — এগুলিকে শাস্ত্রসম্মত নয় বলে প্রমাণ করেছিলেন।
৩. সংস্কারকগণ আইনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর সকলেই সরকারী হস্তক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি।
৪. উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল নারীজাতির কল্যাণের প্রতি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

এ যুগের বাংলার সংস্কারকগণ নারী কল্যাণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সতীদাহ নিবারণে, কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে, স্ত্রী-শিক্ষার সূচনায় ও বিধবা-বিবাহ আইনে নারী কল্যাণের প্রতি মরমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

তবে এই নারী সংস্কার আন্দোলন স্বয়ংক্রিয় চরিত্র পায় নি, নারীরা যেন সামাজিক শৃঙ্খল বন্দিনী। এই শৃঙ্খল মোচনের কাজে পুরুষেরাই এগিয়ে এসেছেন, নারী জাতির নিজস্ব উদ্যোগে তাদের কল্যাণ সাধনে কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয় নি।

*Lecture prepared by*  
**Dr. Ishani Ghosh**

Associate Professor, Department of History, Kalinagar Mahavidyalaya

**প্রশ্ন**

**১২ নম্বর**

১. Discuss the socio-religious reform movements in India between 1818 and 1857.
২. How far is it correct to describe Rammohan Roy as the 'Father of Modern India'?

**৮ নম্বর**

১. What were the limitations of Rammohan Roy as a moderniser?
২. What was the social impact of the Brahmo movement?
৩. What was Vidyasagar's role in the emancipation of women?

**৫ নম্বর**

১. Write a note on the abolition of 'Sati'.
২. Write a note on the Prarthana Samaj.
৩. What was the Suddhi movement?
৪. Write a note on Hindu Widows Remarriage Act of 1856.